**জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস**
**ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩**

# ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ঢাকা নগরীর আধুনিকায়ন ও জন-জীবনে এর প্রভাব

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন*

**Abstract**

Under British rule the people of Dhaka city experienced socio-cultural changes brought through colonial 'modernity', and the impact of 'Bengal's Renaissance' and scientific advancement of the contemporary period on their everyday life.The major concern here is whether the new concepts of rationality, morality and technical advancement were able to influence the corner of the city or did a majority of the common people remained in darkness. Western education, including scientific, medical and literary, received impetus from a small section of the Bengali society and their diverse effects became visible in Calcutta. Many educational centres, Western in nature, took birth under different circumstances, and social evils were questioned by many Western-educated indigenous people. It is true that after Calcutta, compared to the other cities in Bengal, Dhaka went through a visible change during the British colonial period.However, throughout the century, a small number of significant steps were taken to develop and reform the socio-cultural milieu of Dhaka city. There is no hesitation in saying that not only the peripheral people remained out of the 'modernizing agenda', but also the urban poor and uneducated faced the same condition. Keeping in mind the various overwhelming processes of action in a cityscape, in this article, I will try to explore how the city people connected the space and its changing milieu in their everyday life in colonial settings. And how they perceived and responded to the process of modernity. It also focuses on the process of how the city's local inhabitants explained modernity and transformed it in their own ways. This research has been done through qualitative methods using primary and secondary sources including vernacular literature collected from different libraries, archives and museums.

**চাবিশব্দঃ** উপনিবেশবাদ, আধুনিকতা, ঢাকা শহর, স্থানিক রূপান্তর, জনজীবন

## ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে নগরায়ণ ও নগরের স্থানিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল নগর ও নগরে বসবাসকারী জনগণের জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। তবে এই প্রভাবের মাত্রা জন-জীবনের সকল ক্ষেত্রে একই রকম ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল ব্যাপক, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। মুঘল সুবা বাংলার রাজধানীর মর্যাদা লাভের অতীত ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে নিজামতের পরিচয় হারিয়ে বিভাগীয় শহর হিসেবে ঢাকা লাভ করে এক নতুন পরিচয়। ১৮৫৮ সালে ভারতে ব্রিটিশ রাজ এর সরাসরি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকা নগরীর স্থানিক পরিবর্তন তরান্বিত হয়। এর আয়তন, প্রশাসনিক দপ্তরের কাঠামোগত পরিবর্তন, নতুন ও আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রযুক্তিগত ও

---

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ও মানষিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি ঢাকা নগরীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে দৃশ্যমান পরিবর্তন এনেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার আধুনিক নগর হিসেবে কলকাতার পরই ছিল ঢাকার স্থান। আঠারো-উনিশ শতকের ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতার নিকটবর্তী শহর হিসেবে ঢাকার নাগরিক জীবনে আসা পরিবর্তন এবং এই নগরীর গুরুত্ব ও আধুনিকায়নের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ব্রিটিশ অধিকারীগণের লিখিত পত্রাদি এবং উনিশ ও বিশ শতকে ঢাকায় পদার্পণকারী ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ ব্যাক্তিবর্গের উক্তিসমূহ থেকেও ধারণা পাওয়া যায়। ফলে এ অঞ্চলের নগর ইতিহাস রচনায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব আজ বহুল আলোচিত বিষয় হিসেবে ইতিহাসে অধীত। কিন্তু এই আধুনিকায়নের প্রভাব জন-জীবনে কতটুকু বিস্তৃতি লাভ করেছে, তা নিয়ে এখনো গবেষণা চলমান। বর্তমান প্রবন্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতের অন্যতম নগর ঢাকায় তৎকালীন শাসকদের আমদানিকৃত আধুনিকতা, নগরীর স্থানিক ও অবকাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে জন-জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা চিহ্নিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

**গবেষণার যৌক্তিকতা**

ঢাকার নগরায়ণের ইতিহাস রচনা একটি নতুন প্রয়াস। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের সম্পাদিত রচনাবলী ও গবেষণাকর্মে ব্রিটিশ-ঔপনিবেশিক আমলে ঢাকাকে একটি আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে স্থানিক, অবকাঠামোগত ও প্রতিবেশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছিল এবং তার ফলে ঢাকার জন-জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পরেছিল তার প্রকৃতি নির্ণয় ও এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের প্রয়াস সীমিত। ফলে বর্তমান গবেষণাকর্মটি নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এই শূন্যতা পূরণ করবে। নগরের স্থানিক ইতিহাস একটি জাতির সামগ্রিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে। ফলে উক্ত ইতিহাস নির্ণয়ে পরিচালিত বর্তমান গবেষণাকর্মটি ঢাকার নগরায়ণের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে এবং একটি ইতিহাস সচেতন জাতি গঠনে সহায়তা করবে।

**গবেষণা পদ্ধতি**

বর্তমান প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে মূলত গুণগত পদ্ধতি (Qualitive method) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস ব্যবহার করে এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসসমূহ বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আলোচ্য সময়কালের (উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগ) সিটি কর্পোরেশন রেকর্ড, মিউনিসিপাল রেকর্ড, পাবলিক হেলথ অ্যান্ড সেনিটেশন ফাইলসমূহ, এডুকেশন ডেসপাসসমূহ, সরকারি প্রসেডিংস, সার্কুলারসমূহ, গ্যাজেটসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। আহসান মঞ্জিল যাদুঘরে ঢাকার নবাবদের রক্ষিত দলিলপত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত সরকারি প্রসেডিংস, গ্যাজেট ও সমকালীন পত্রিকাসমূহ প্রাথমিক উৎসের জোগান দিয়েছে। এছাড়া সমকালীন পত্রিকাসমূহ, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ঢাকা প্রকাশ পত্রিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া, গ্রাম বাংলা প্রবেশিকা, বঙ্গবাণী, ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মিলনী সভা ও ব্রাহ্ম সমাজের সভার বার্ষিক বিবরণী ও আঞ্জুমান (ঢাকা) এর বার্ষিক বিবরণীসমূহ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঢাকার জনজীবনের বিবিধ সমস্যা নিয়ে প্রকাশিত বিবৃতিসমূহ আলোচ্য প্রবন্ধকে তথ্য সমৃদ্ধ করেছে। আলোচ্য সময়ে লেখা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ভ্রমনকাহিনি এবং আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থাদি অন্যতম মূল্যবান উৎস হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে। তবে গবেষণার ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও এর যৌক্তিকতা নির্ণয়

তথা কাঠামো বিন্যাসের জন্য দ্বৈতীয়িক উৎসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় এটি মূল্যবান উৎসের যোগান দিয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি একটি মৌলিক গবেষণা যা এই দুই ধরনের উৎসের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

## নগর ইতিহাস চর্চার ধারা ও ঔপনিবেশিক ঢাকার নগরায়ণ

নগরায়ণের ইতিহাস মানব সভ্যতার উন্মেষের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে বদলে যায় এর প্রকৃতি ও পরিধি। ফলে একটি শহর বা নগরের পতনও সভ্যতার বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।  ঐতিহাসিকগণ সাধারণত মেসোপটেমিয় সভ্যতাকে নগর সভ্যতার সূচনাকাল হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে।[১] কেননা খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৩৫০০ অব্দে এ অঞ্চলে নগরায়ণের বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ড 'নগরায়ণ বিপ্লব' (Urban Revolution)[২] এর দশটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন, তার মধ্যে জনসংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি অন্যতম। এ সকল বৈশিষ্ট্যের অনুসঙ্গ হিসেবে লিখন পদ্ধতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও পৌর কর্মের বিস্তৃতি ঘটে।[৩] মেসোপটেমিয় অঞ্চলে এ সকল বৈশিষ্ট্যের বিকাশ প্রথম ঘটেছিল, এমনটি ধরে নিলে এ সময়কালকে নগর সভ্যতার সূচনাকাল ধরা যায়। এর ধারাবাহিকতায় মিশর, গ্রিস, রোম, পারস্য ও ভারতসহ পৃথিবীর বহু অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার হাত ধরে নগরায়ণের বিস্তৃতি ঘটে। বাংলায় নগরায়ণের সূচনাকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গবেষণা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রাচীন লিপিমালা ও সমকালীন সাহিত্যের উৎস থেকে গঙ্গা বিধৌত বাংলায়[৪] নগরায়ণের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। প্রাচীন ভারতের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সমসাময়িক না হলেও এর প্রাচীনত্ব সর্ম্পকে এ সকল উৎস থেকে ধারণা পাওয়া যায়।[৫] প্রাচীন বাংলার নগরায়ণের কারণ হিসেবে ইতিহাসবিদ গোলাম মরতুজা সম্পদের প্রাচুর্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিহার নির্মাণকে প্রধান উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেন।[৬] এছাড়া তার মতে পলিবিধৌত এ অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়ায় নদীতীরসমূহে যে ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে ওঠে, কালের আবর্তে তা নগরে রূপান্তরিত হয়।[৭] সময়ের আবর্তে নদীর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে পুরাতন নগরের অবক্ষয় ও নতুন নগরের সূচনা হয়েছে। বলা যায়, বাংলায় নগরীর ভাঙা-গড়ার এই চলমান প্রক্রিয়ার ইতিহাস অতি পুরাতন হলেও তা অনুসন্ধানের প্রয়াস এখনও অনেকটাই নতুন।

এ প্রসঙ্গে ভারতের ঔপনিবেশিক নগর ইতিহাসবিদ কেনিথ এল গিলিয়ন এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বিশ শতকের মাঝামাঝিতে আহমেদাবাদ নগরের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে অনেকটা আক্ষেপের সুরে বলেন–

> Modern Indian historiography no longer confines its study to the activities of rulers. The Indian nationalist movement is receiving close attention from scholars in several countries, as are the effects of British law and land revenue settlements on the social structure of rural India. But those who wish to read about Indian cities are still more likely to look to the works of geographers and sociologists than to urban history.[৮]

কালের আবর্তে নগর ইতিহাস রচনায় গতি সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। নগর ইতিহাস রচনার অংশ হিসেবে গবেষকগণ নানাবিধ প্রশ্নের অবতারণা করেন; যেমন-শহরের কেন্দ্র ও এর বিন্যাস প্রক্রিয়ায় শহরের সাথে তার পশ্চাদভূমির মধ্যেকার সম্পর্ক এবং একইসাথে নগর অধিবাসীর যাপিত জীবনে

এ ধরনের সম্পর্কের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও এর গতি-প্রকৃতির রূপ অনুসন্ধান প্রভৃতি। এ ধরনের অনুসন্ধান মূলত একটি শহরের উত্থান-পতনের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত।[৯] এ সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নগরায়ণ নিয়ে গবেষণা বর্তমানে ভূগোলবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণায় সীমাবদ্ধ না থেকে অধিবিদ্যার বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্থাপত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা। এ প্রসঙ্গে নগর ইতিহাসবিদ নারায়ণী গুপ্ত বলেন, "নাগরিক ইতিহাস আন্তর্বিষয়গত (inter-disciplinary) দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে। ভূগোলবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, স্থপতি, পুরাতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী- সবার কাছ থেকেই ইতিহাসবিদদের কিছু শেখার আছে।"[১০]

নগরের সংজ্ঞা ও এর প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে ঐতিহাসিক, ভূগোদবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, প্রত্নতত্ত্ববিদ বিবিধ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। বাংলা একাডেমির অভিধায় নগর এর শব্দটির অর্থ নানা পেশার বহুসংখ্যক  লোকের আবাস ও শিল্প-বাণিজ্যাদির স্থান।[১১] আবার এর সমার্থক শব্দ 'শহর' বলতে বোঝায় বড় নগর, মহানগর বা রাজধানী।[১২] নগরের বহুবিধ সমার্থক শব্দ পাওয়া যায় পালি সাহিত্যে। করুণানন্দ ভিক্ষু তার *পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন* গ্রন্থে নিগম, নগর, নগরক, রাজধানী, পুর, প্রভৃতিকে নগর হিসেবে চিহ্নিত করেন। নগরের সংজ্ঞা দিতে তিনি উল্লেখ করেন "নগর- এর প্রধান ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হলো- গ্রামাঞ্চলের তুলনায় স্বল্পমাত্র স্থান আশ্রয় করে অধিকতর সংখ্যক লোকের বসবাস, সীমাবদ্ধ আবাসস্থল, প্রধানত খাদ্যোত্তর সামগ্রীর উৎপাদন ও অন্যদিকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের জন্য গ্রাম নির্ভরতা, বণিকশ্রেণির সঙ্গে গভীর  সম্পর্ক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এমন কি, ব্যবসা-বাণিজ্যগত এবং কখনো ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে গুরত্ববহ ছিল"।[১৩] এক কথায় বলা যায়, ইংরেজি *Urbanization* বা বাংলা নগরায়ণ মানব সভ্যতা গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেখানে নগর হলো মানুষের 'সভ্য' কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু।[১৪] নগরায়ণের হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য যে সকল উপাদান মূখ্য ভূমিকা পালন করে তাকে নগর ইতিহাসবিদ সুবিকাশ মুখোপাধ্যায় চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো: ১. ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাগত শ্রেণি, ২. অর্থনৈতিক শ্রেণি, ৩. সমাজ ও সংস্কৃতিগত শ্রেণি এবং ৪. পরিকাঠামোগত শ্রেণি।[১৫] তাছাড়া কোনো স্থানে নগরায়ণের উপাদানগুলো কতটা কার্যকর তার নির্ভর করে ঐ স্থানের অধিবাসীর মোট আয় বা পেশার উপর। এর সাথে স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতিগত শ্রেণিটিও নগরায়ণের প্রকৃতি গঠনে ভূমিকা রাখে। ফলে কোন স্থানের নগরায়ণের স্বরূপ নির্ভর করে স্থানীয় জনগনের যাপিত জীবনের গতি-প্রকৃতির উপর। এই দিকগুলো বিচার করে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, প্রাক-ব্রিটিশ বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তবতায় এই উপাদানের অভাব ছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোতে নগরায়ণের ধাঁচ সর্বদা একই ধারায় গড়ে উঠেছিল তা নয়, বরং প্রত্যেক নগরীই কতগুলো আলাদা কারণ ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। দেখা যায়, পুঁজিবাদী কৃষি অর্থনীতি, রেলপথ এবং রেল স্টেশন, প্রশাসনিক প্রয়োজন, ইয়োরোপীয় গ্রীষ্মাবাস স্থাপনের যৌক্তিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে নতুন নতুন নগর গড়ে ওঠে; আবার পুরোনো নগরীর রূপ পরিবর্তিত হয়। তবে জনপদকে নগর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণির জন জরিপ শুরু হলে ১৮৭২ এর সেন্সাস অধিকর্তা জে সি জেক মন্তব্য করেন, এ অঞ্চলের সিংহভাগ শহর "actually half towns and half village"[১৬] বলা যায়, বর্তমানকালেও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক শহরে পর্যাপ্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে, অথচ

জনসংখ্যার ভিত্তিতে এগুলো বৃহৎ শহরের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঢাকার ক্ষেত্রেও এই সত্যটি প্রযোজ্য। উনিশ ও বিশ শতকের ঢাকায় নগরায়ণের উপাদানগুলো কীভাবে স্থানীয় অধিবাসীর যাপিত জীবনের উপর কতটুকু কার্যকরী প্রভাব ফেলেছে– তা আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

ঢাকা নগর ও এর নাগরিক চরিত্র অন্বেষণের ইতিহাস আলোচনা ব্যাপক বিস্তৃত নয়। ঔপনিবেশিক ঢাকার নগরকেন্দ্রিক ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে যেখানে ক্ষুদ্র পরিসরে ঢাকার জন-জীবন সম্পর্কে আলোচনাও পাওয়া যায়। আলোচ্য সময়কালের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সৈয়দ আওলাদ হাসান এর *Antiquities of Dacca (1905)* সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর রচিত *Glimpses of Old Dhaka: A short Historical Narration of East Bengal and Assam with special Treatment of Dhaka (1956)* এবং আহমেদ হাসান দানী রচিত *Dacca: A Record of Its Changing Fortunes (1956)* গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখযোগ্য। কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনাধীনে লিখিত চার্লস ড'য়েলির রচিত *Antiquities of Dacca,* (1814), জেমস ওয়াইজ রচিত *Notes on the Races, castes and trades in Eastern Bengal* (1883)ও বার্ডলি বার্ট রচিত *The Romance of an Eastern Capital*(1906) গ্রন্থসমূহ ঢাকার ঔপনিবেশিক ধারার নগরায়ণ ও নাগরিক জীবন সম্পর্কিত প্রামান্য দলিল হিসেবে বিবেচিত। এ সকল গ্রন্থের বেশিরভাগই ঢাকার ইতিহাস বর্ণনায় মূলত এ অঞ্চলে ব্রিটিশপূর্ব ও তৎপরবর্তী কালের টিকে-থাকা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতাদির বর্ণনা ও পরিচয় প্রাধান্য পেয়েছে। পাশাপাশি ঢাকার নগরায়ণের প্রকৃতি, সমাজ, সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও প্রচলিত রীতি-নীতি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে ঢাকার ইতিহাস রচনায় এ সকল গ্রন্থের অবদান অনস্বীকার্য।

আঠারো ও উনিশ শতকে ঢাকার জন-জীবন ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে উর্দু ও ফার্সিতে লেখা কিছু গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায়। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে মুনসী রহমান আলী তায়েশ রচিত *তাওয়ারিখে ঢাকা*, হাকিম হাবিবুর রহমানের *ঢাকা পঁচাশ বরস পেহলে*, *আসুদগানে ঢাকা* গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য। এ সকল গ্রন্থে তৎকালীন ঢাকাবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তায়েশ মুঘল ঢাকার নাজিম ও নায়েব নাজিমদের শাসনকাল, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে প্রচলিত ইতিহাস, তাদের অধীনে ঢাকার নাগরিক উন্নয়ন, ধর্মীয় ও পার্থিব স্থাপত্য ও অবকাঠামো নির্মাণসহ ১৯০৫ সালে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর সিভিল স্টেশন হিসেবে রমনার নবরূপে প্রতিষ্ঠালাভ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। হাকিম হাবিবুর রহমানের *ঢাকা পঁচাশ বরস পেহলে* গ্রন্থটির আলোচনার সীমা উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত। তবে এই গ্রন্থটিকে বাংলা বিভাগপূর্ব ঢাকার সমকালীন সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি চর্চা তথা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে লেখা একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সকল আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে ঢাকার স্থানিক বিবর্তনের পাশাপাশি জন-জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল প্রসঙ্গ বর্তমান গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। তবে ব্রিটিশ শাসকগণ ঢাকাকে একটি আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তোলার যে প্রয়াস নিয়েছিল এবং তা ঢাকার অধিবাসীগণ কীভাবে গ্রহণ ও আত্মস্থ করেছে কিংবা বাতিল করেছে–তা আলোচনার কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না।

ঔপনিবেশিক ঢাকার নগরায়ণ সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে শরীফ উদ্দিন আহমেদ রচিত, *Dhaka: A Study In Urban History & Development 1840-1921* গ্রন্থে লেখক ব্রিটিশ কোম্পানি ও রাজ আমলে ঢাকার নগরায়ণের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ঢাকায় আধুনিক নাগরিক সুবিধাগুলো প্রণয়নের জন্য ইংরেজ শাসক ও সিভিলিয়ানদের প্রচেষ্টা, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততা ও বিরোধিতা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে ঢাকার স্থানিক পরিবর্তনে বিষয়গুলো কীভাবে কাজ করেছে, সে সম্পর্কে বিশ্লেষণের পরিসরটি সীমিত। শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত *Dhaka Past Presesnt Future* (1889) গ্রন্থে আব্দুল মুমিন চৌধুরী ও শবনব ফারুকীর যৌথভাবে লেখা 'Origin and Development of Mughal Dhaka' এবং সম্পাদকের লেখা 'Municipal Politics and Urban Developments in Dhaka (1885-1915)' প্রবন্ধে ঢাকার নাগরিক জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার ৪০০ বছর উপলক্ষে ২০১২ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *Urbanization and Urban Development* শিরোনামের ৩ নম্বর ভ্যলুমে এ কে এম গোলাম রব্বানী 'Parks and Open Spaces in British Times'[১৭] শিরোনামের প্রবন্ধে ঢাকার পার্ক, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানগুলোর বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক ঢাকায় উন্মুক্ত বিনোদনের স্থানগুলোর বিকাশ ও ঢাকার নগরায়ণের এ সকল স্থানের গুরুত্ব নির্ণয়ে এই প্রবন্ধটি উল্লেখের দাবি রাখে।

ঢাকা সম্পর্কে বহুবিধ তথ্যের সমাহার ঘটিয়েছেন ঢাকা নিয়ে বহু গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে তার লেখা *ঢাকা সমগ্র* অন্যতম। ছয় খণ্ডে লেখা এই গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ ঢাকার পরিচয়, প্রাক-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক ঢাকার বিবর্তন ও ঢাকার আধুনিকায়নে স্থানীয়দের ভূমিকা– সব কিছুই সাবলীল ভাষায় ফুটে উঠেছে। এই সকল লেখনীর উৎস সরকারি দলিলপত্র, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও আত্মজীবনী– তবে সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা এ সকল গ্রন্থে আধুনিক ঢাকা নির্মাণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিত্তবান শ্রেণি, ঔপনিবেশিক অধিকারীগণ তথা ঢাকা মিউনিসিপালিটির মধ্যকার দীর্ঘ বিরোধ এবং এর ফলস্বরূপ ঢাকার এ সকল শ্রেণির মধ্যেকার ত্রিপক্ষীয় সম্পর্কের সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা বা বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। অথচ নগরের স্থানিক পরিবর্তন নাগরিকের মধ্যকার সম্পর্কই নির্ধারণ করে। বর্তমান গবেষণায় এ সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণে এসকল অনুল্লেখিত বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধনের মাধ্যমে ইতিহাসের শূন্যতা পূরণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

**ঔপনিবেশিক আধুনিকায়ন ও ঢাকার নগরজীবনে এর প্রভাব**

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে ঔপনিবেশিকতা একটি পুরাতন ও বহুল ব্যবহৃত পন্থা হলেও যুগের আবর্তে তার প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন ঘটেছে। মার্কসবাদীগণ ঔপনিবেশিকতার রূপ নির্ণয় করতে গিয়ে ইউরোপীয় ধরণ থেকে আদি ঔপনিবেশিকতার পাথর্ক্যকে পুঁজির নিগরে বিচার করেছেন। এ অনুযায়ী আদি উপনিবেশকে প্রাক-পুঁজিবাদী ও আধুনিক উপনিবেশ ইউরোপীয় পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত।[১৮] ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশ আধুনিক ঔপনিবেশিক চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল যার মূল লক্ষ্য ছিল এ অঞ্চলের রাজস্ব, রসদ, সম্পদ হস্তগত করে বিজয়ী রাষ্ট্রের অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং এ লক্ষ্যে ঔপনিবেশিত ও উপনিবেশক রাষ্ট্রের মধ্যে মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করা। স্ফীত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উপনিবেশক রাষ্ট্রযন্ত্র নানা

কৌশল ও তথাকথিত আদর্শের ঘেরাটোপ তৈরি করে তা উপনিবেশিতদের উপর প্রয়োগ করে। এই প্রক্রিয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল ইউরোপীয় পুঁজিবাদ ও শিল্পের উন্নয়নের অবধারিত ফসল। ষোড়শ শতকে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে পণ্য উৎপাদন ও তা বিক্রির জন্য বিশ্বের নানা অঞ্চলে যে বাজার তৈরির প্রবণতা দেখা যায় তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করেছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার বিরাট ভূমির রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার ও এ সকল ভূমি থেকে প্রাপ্ত পুঁজি ও পুঁজির সঞ্চালনের মাধমে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল সর্বাধিক। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ফল ছিল এ সকল অঞ্চলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা। আর আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে[১৯] চিহ্নিত করা হয় পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশ তথা আধুনিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের রমরমা রূপ দেখা যায়। রেলগাড়ি আর টেলিগ্রাফের প্রবর্তন গোটা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতা কেন্দ্রিক করে দেয়। এ সকল পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফলাফল ছিল দৃশ্যমান। পাশাপাশি নতুন শাসকশ্রেণি কর্তৃক এ অঞ্চলে সাংস্কৃতিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা খুব সচেতনভাবেই শুরু হয়েছিল। কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতার দৃঢ়করণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ছিল টেকসই প্রশাসন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ। একই সাথে বিজিত অঞ্চলে বিজয়ীদলের শাসনকে আইনসম্মত করা এবং শাসন ও শোষণের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যে পদ্ধতি প্রবর্তিত হলো, শাসকশ্রেণির ভাষায় তা ছিল "Civilizing Mission"[২০] যাকে সভ্যতাকরণ প্রক্রিয়াও বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ শাসকগণের দ্বারা প্রবর্তিত এই সভ্যতাকরণ প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কেরি এ ওয়াট (Carey A. Watt) এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, "For the British Raj in India the civilizing mission meant many things, including bringing the benefit of British culture to the subcontinent in the form of free trade and capitalism as well as law, order and good government."[২১] কেননা শাসকশ্রেণি উপনিবেশক ও উপনিবেশিত জনগোষ্ঠির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য খুঁজে বের করেন, যেখানে সভ্যতার বিচারে স্থানীয় বা উপনিবেশিত জনগণ ছিল ব্রিটিশদের তুলনায় এবং বৃহৎ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জনগণের তুলনায় নিম্নমানসম্পন্ন সভ্যতার ধারক। ফলে পিছিয়ে পরা বা তুলনামূলক অনুন্নত ও নিম্ন মানসম্মত জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য সভ্যতাকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনকে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যকরণীয় হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়। তবে এই প্রক্রিয়াটি ছিল ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি আলাদা সংস্করণ যা ঔপনিবেশিক অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে উপনিবেশিতদেরকে এক ধরনের "নতুন ও উন্নত সংস্কৃতির" ঘেরাটোপে ফেলে রাষ্ট্র ও সমাজে অধীত সংস্কৃতিবাহী একটি সভ্য গোষ্ঠি তৈরি করা। ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিস্তৃতি সাধনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তারা ইংরেজি শিক্ষাকে বেছে নিয়েছিল। শাসকশ্রেণির এই প্রচেষ্টার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্রিটিশ ভূষণ ও চিন্তাধারা সম্বলিত এক শ্রেণির সচেতন নাগরিকের জন্ম হতে দেখা যায়, যারা ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা সংস্কারক মেকলের (Thomas Babington Macaulay) কাঙ্ক্ষিত শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[২২] বাংলায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত স্থানীয় অধিবাসীর একটি বড় অংশ ভদ্রলোক অভিধা নিয়ে সমাজে এক নতুন শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল। সরকারি উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার ও মিশনারিদের প্রচেষ্টায় দেশীয় কায়দায় শিক্ষা প্রদানের চেষ্টার ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার গ্রাম ও মফঃস্বল এলাকায় স্বল্প পরিষরে বিস্তার লাভ করে। শহর বা নগরকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সভ্যতার

উপাদানগুলোর বিস্তৃতি ঘটতে থাকে বিধায় রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জমিদার, ব্যবসায়ী ও বেনিয়া গোষ্ঠির একটি বড় অংশ শহর ও নগরগুলোতে বসতি স্থাপন করতে থাকে। এতে করে একদিকে যেমন তারা বিনা ক্লেশে জমির খাজনা প্রদানসহ পেশা ও কর্মের সাথে সম্পর্কিত প্রশাসনিক প্রয়োজন মিটাতো এবং নগরে প্রবর্তিত আধুনিক নাগরিক সুবিধা লাভ করতো, অন্যদিকে তাদের সন্তানরা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতো। সংখ্যার দিক থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এই শ্রেণি খুব শক্তিশালী না হলেও সময়ের আবর্তে সমাজে তাদের ব্যাপক প্রভাব তৈরি হয়। এই শ্রেণির একটা বড় অংশ সরকারের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হওয়ার কারণে শাসক শ্রেণির সাথে তাদের সর্ম্পক ছিল নিবিড়। ফলে নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা ও তার সমাধানের ক্ষেত্রে এই শ্রেণির আগ্রহ ছিল দৃশ্যমান। ঢাকার নাগরিকদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। মূলত ইউরোপীয় প্রযুক্তিগত উন্নতি লব্ধ আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার দ্বারা কলেরা ও প্লেগের ন্যায় মহামারি মোকাবেলা, পাকা রাস্তা নির্মাণ, পয়োঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থাসহ নগরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি যে আধুনিক নগরজীবনের ধারণা নিয়ে আসে তা নগরবাসীর মানস জগতে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও শাসকগোষ্ঠির প্রতি আজ্ঞাবহ শ্রেণি এ সকল ব্যবস্থাকে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের প্রতিবেশকে পরিবর্তনের বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ শাসকদের আনীত ব্যবস্থাদি প্রয়োগে সহযোগিতা করেন। এ সকল ব্যবস্থাদি সর্ম্পূণ ও ত্রুটিমুক্ত ছিল না এবং তা সার্বজনীনও ছিল না। যার ফলস্বরূপ, একদিকে উন্নত নাগরিক সুবিধা লাভের আকাঙ্খা ও অন্যদিকে এই ব্যবস্থাদির দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টা ঢাকা নগরীর জন-জীবনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত করে ফেলে। যদিও দরিদ্র ও শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত শহুরে অধিবাসী এই আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত ছিল না, তথাপি এই প্রক্রিয়ার তাদের অনেককেই বাস্তুচ্যুত ও স্থানচ্যুত এমনকি জীবিকাহীন হতে হয়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উনিশ শতকের ঢাকা ছিল বিভাগীয় কমিশনারের অধীনে পরিচালিত একটি বিভাগীয় সদর দপ্তর। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের বহু শহরের ন্যায় মুঘল সুবার রাজধানীর জৌলুশ ও শিল্পউৎপাদনকারীর মর্যাদা হারিয়ে ততদিনে ঢাকা পরিণত হয়েছিল একটি ছোট মফস্বল শহরে– যেখানে জেলা সদরের সিভিল স্টেশনকে কেন্দ্র করে শহরের আবর্তন হয়েছিল। পূর্ব বাংলার ধনী ও প্রভাবশালী জমিদার শ্রেণির বসবাস ছিল মূলত কলকাতায়। ঢাকায় বসবাস করতেন ছোট জমিদাররা। ব্রিটিশ শাসনাধীনে রেলপথ স্থাপন ও জলপথে স্টিমার সার্ভিস চালু করার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের পারস্পারিক যোগাযোগ দ্রুততর হলে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়। প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কারণে ও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ সকল অভিগমন হলেও শিল্পকারখানার অভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল স্বাভাবিক। স্বাভাবিকভাবেই এ সময়ে ঢাকা নগর, গ্রাম ও শহরের যুগল চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তবে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যার দিক থেকে কলকাতার পরই ঢাকার স্থান হওয়ায় উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ নাগাদ এটি মধ্যবিত্তের শহরে পরিণত হয়। কেননা ঢাকায় বসবাসকারীরা ছিল মূলত প্রশাসনিক ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত, যেমন– উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি। এ সকল পেশাজীবীদের অর্থনৈতিক অবস্থাই তাদের জীবনমান ও সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করতো। ফলে দেখা যায়, অধিকতর সুযোগ-সুবিধা, কাঙ্ক্ষিত পেশা এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন লাভের জন্য এই অভিগমন প্রক্রিয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী এই শ্রেণি সর্বদাই তাদের

কল্পনা ও বাস্তবতায় শহর ও গ্রামের এক ধরনের সম্মিলন ঘটাতে চাইতেন, যা শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিচালিত করতো। কিন্তু চরিত্রগত দিক থেকে শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য ও ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় এবং শ্রেণির ক্ষেত্রে শহরের সার্বজনীন রূপ কখনো ব্যক্তি মানসে একাকিত্বের অনুভূতি জাগ্রত করতো।[২৩]সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ফ্রেন তঙ্কিস (Fran Tonkiss) এই ধরনের অনুভূতিকে নগর জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল বলে মন্তব্য করেন, যা সমাজবিজ্ঞানী ওয়াল্টার বেঞ্জামিন 'Lonely and lost' বলে আখ্যায়িত করেন এবং একইসাথে এই অবস্থাকে নগরের কোলাহলপূর্ণ জীবনে কাঙ্ক্ষিত অবস্থা বলে মন্তব্য করেন। এ সম্পর্কে মিশেল ডি কার্টেও (Michel de Certeau) তার বিখ্যাত *The practices of everyday life* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, নগর ব্যাক্তি জীবনের বস্তুগত ও আদর্শিক দিককে এমন এক দ্বান্দিক অবস্থায় উপনীত করে যার দ্বারা ব্যক্তি নগর জীবনে তার অবস্থানকে সুনির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয় এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা সামগ্রিকতাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজতাত্বিকদের এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী নগরের রাজনৈতিক ও স্থানিক পরিবর্তন সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ফলে তাদের মতে নগরে নতুন আগমনকারী ব্যক্তি এ সকল বস্তুগত ও আদর্শিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হবে ও নিজেও এর অংশে পরিণত হবে। উনিশ-বিশ শতকের ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এর ব্যতিক্রম ছিল না। ঔপনিবেশিক বাতাবরণে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে গঠিত সচেতন শ্রেণি তৈরির ব্রিটিশ প্রচেষ্টা অনেকটাই সফল হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন কলকাতা মিউনিসিপালিটির অধিকর্তা  ও জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিন চন্দ্রের মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি কলকাতা শহরের নাগরিক সুবিধাদির ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ ও সচেতন নাগরিকের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করেন এবং এর সাফল্য ও ব্যর্থতাকে নাগরিক সচেতনতার উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। তিনি এ ধরনের জ্ঞানকে "certainly much greater help to the development of man's higher or spiritual life" বলে মনে করেন।[২৪] এ সময়ে ঢাকার উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত সচেতন নাগরিক একদিকে নগরে নিজেদের জন্য আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরীতে ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী অন্যদিকে রাষ্ট্র ও সমাজে নিজেদের অবস্থান তৈরির ক্ষেত্রেও ছিলেন একইভাবে উৎসাহী। ফলে এ সকল বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য শ্রেণির সাথে সংঘাত ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের ফলে যে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের জন্ম হয় তা হোমি ভাবার (Homi Bhaba) মতে "hybrid space" বা "third space"[২৫] হলেও ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের মতে এটি নগরে মিশ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্ম দেয় যেখানে ব্যক্তিগত ও সমিষ্টিক পরিচয় একই সাথে বিদ্যমান থাকে।[২৬] গ্রামবাংলা প্রবেশিকা নামক একটি স্থানীয় পত্রিকা তৎকালীন গ্রামবাংলার পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কে একটি রিপোর্টে গ্রামের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানির অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, নোংরা পোষাক পরিধানকে ম্যালেরিয়া, গুটিবসন্তসহ নানা রোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।[২৭] এ ধরনের রিপোর্ট একদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান দ্বারা কল্পনাশ্রিত সবুজ শ্যামল গ্রামকে অস্বাস্থ্যকর হিসেবে চিহ্নিত করা অন্যদিকে গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্নতা ও শহুরে পরিবেশে অভ্যস্থতার ইঙ্গিত দেয়। তাছাড়া 'আধুনিক শহর মানেই স্বাস্থ্যসম্মত শহর'– এটিই ছিল তৎকালীন শহরের মূল ধারণা। ফলে শহরের নাগরিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য এবং নাগরিক সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন, নিবেদন ও দাবি-দাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক।

তবে এ ধরনের সচেতনতা শ্রেণি বিভেদহীন, সার্বজনীন ও সমতাভিত্তিক ছিল না। যার ফলে দেখা যায়, একদিকে এই সচেতন শ্রেণি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকে সমালোচনা করে তার প্রতিকার চেয়েছে, আবার একই সমাজে বসবাসকারী নগরবাসীকে তার আর্থিক অবস্থা ও পেশাগত অবস্থান ও আধুনিকতা সাথে বেমানান হিসেবে আলাদা করার দাবি করেছে। সরকারি দলীল-পত্র ও ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় এ ধরনের বিষয়ের অবতারণা পাওয়া যায়। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, ঢাকা দিন দিন অস্বাস্থ্যকর শহরে পরিণত হয়ে পড়েছিল। শহরের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল এবং এর ফলে খালি জায়গা ও অস্বাস্থ্যকর জায়গায় বাড়িঘর তৈরি হতে শুরু করে- যা শহরের পরিবেশকে বিঘ্নিত করেছিল। রিপোর্টে দাবি করা হয় যে শহরের প্রতি মহল্লায় কমপক্ষে দুই-তিন ঘর মুচি, চামার শ্রেণি রয়েছে। তারা যেখানে সেখানে জীবজন্তুর হাড়, পঁচা মাংস প্রভৃতি ফেলে রাখে যা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে।[২৮] অন্যদিকে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় ছড়িয়ে থাকা বারাঙ্গনাদের নাগরিক সমাজের স্বাস্থ্যগত ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে মতামত দেয়া হয়। এই অবস্থা থেকে শহরের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার জন্য এই মুচি, চামার ও বারাঙ্গনা শ্রেণিকে শহরের প্রান্তে আলাদা জায়গায় স্থানান্তরের প্রস্তাব দেয়া হয়। ফলে দেখা যায়, সমাজে নব্য প্রতিষ্ঠিত এই ভদ্রলোক শ্রেণি আধুনিক জীবনকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যেখানে অস্বাস্থ্যকর বলতে স্থান বা বস্তুর পাশাপাশি ব্যাক্তি ও পেশাকেও চিহ্নিত করেন। আবার মিউনিশিপালিটি প্রদত্ত নাগরিক সুবিধা প্রদানের অপর্যাপ্ততা ও শহরের উচ্চবিত্তদের এলাকার সাথে সাধারণ এলাকার পার্থক্যকেও চিহ্নিত করেন এবং এর কঠোর সমালোচনা করেন। এমনকি ১৮৮৫ সালে যখন মিউনিসিপালিটির পরিচালনা পর্ষদে দেশীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনো এই অবস্থার খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটে। ফলে সচেতন নাগরিক সমাজে এ নিয়ে অভিযোগ ও হতাশার জন্ম হয়। এই ধরনের হতাশা এবং অভিযোগ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠির চরিত্র উন্মোচনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। কেননা, শাসকগোষ্ঠি কাগজে-কলমে ধর্ম-নিরপেক্ষতা, সমতা, ব্যাক্তিগত যোগ্যতার কথা বললেও প্রকারান্তে তার কোনোটিই অনুসরণ করেনি। তারা স্থানীয়দের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি ছিল অনেকটাই শ্রদ্ধাহীন। ঢাকা প্রকাশের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৮২ সালে ঢাকায় উলাউরা (কলেরা) মহামারি দেখা দিলে নওয়াবপুরবাসী হিন্দু সম্প্রদায় প্রতিরাতে এই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য নবাবপুরের রাস্তায় রাস্তায় কীর্তন শুরু করেন। এক সময়ে ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তার গাড়ি কীর্তনকারীদের মিছিলের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করলে হতাহতের ঘটনা ঘটে। এর বিচার দাবি করলে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে রাস্তায় কীর্তন নিষিদ্ধ করা হয়। শাসকগোষ্ঠির এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[২৯] এ সকল উদাহরণ থেকে ধারণা করা যায়, আধুনিকতা নাগরিক জীবনে যে পরিবর্তনের সূচনা করে তার ফলে উপনিবেশক আর উপনিবেশিতের মধ্যে এক ধরনের অন্তর্নিহিত সংঘাতের সূচনা হয় এবং শহরের স্থানিক ও প্রতিবেশিক পরিবর্তনের জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবার একই সাথে স্থানীয়গণ নিজেদের মধ্যকার বিভাজনকে ভিন্ন আঙ্গিকে সামনে নিয়ে আসে। এই বিভাজন শুধু আধুনিক সচেতন ও উচ্চপেশার আভরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি সমাজে নারী-পুরুষের সমবণ্টনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছিল। নিসংন্দেহে বলা যায়, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল ঢাকার নারী সমাজ লাভ করেছে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণকামী ব্যাক্তিবর্গ ও সমাজ সংস্কারক সংগঠনের একক ও যৌথ প্রচেষ্টায়। সমাজের হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের নারীরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে।

তবে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকের তুলনায় ভদ্রমহিলাদের সংখ্যা ছিল নামমাত্র। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এ সকল ভদ্রমহিলারা মূলত ঘরের জন্য মানানসই হবে- এটাই ছিল আদর্শ। এ প্রসঙ্গে সমাকালীন লেখিকা চারুশিলা মিত্র বলেন,

> These days much is heard about the social reform, but in reality, nobody comes forward to dedicate his or her life for the development of society. […]. Currently, we are engaged in political rhetoric, striving eagerly for the autonomous rule. Alas! the oppressions and problems which exist within our society and which call for urgent eradication are often neglected. Disunity among the Bengalis is thought to be their chief defect.[30]

তবে স্বল্প পরিসরে হলেও এই পরিবর্তন ও প্রচেষ্টা নারীর ঘর ও বাইরের মধ্যে একটি মেলবন্ধন তৈরি করতে সাহায্য করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে নিজেদেরকে দৃশ্যমান করার প্রক্রিয়াটি এ সময় থেকেই সূচিত হয়েছে। সমাজে বিদ্যমান নারীর প্রতি সহিংসতা, কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ও সতীদাহ প্রথার ন্যায় অমানবিক কর্মকাণ্ডের খুব কমই বিলুপ্ত হয়েছিল।

## উপসংহার

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্রিটিশদের আমদানিকৃত ইউরোপীয় আধুনিকতা কিভাবে ঢাকার জন-জীবনে প্রভাব ফেলেছিল; এই প্রভাবের ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা এই নব্য আধুনিকতার কতটুকু গ্রহণ ও বর্জন করেছিল– তা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও ঔপনিবেশিক পরিবেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় অধিকারের জায়গাগুলোকে আবিষ্কার ও অধিকার প্রয়োগ সহজসাধ্য ছিল না, তথাপি আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও প্রযুক্তির উন্নয়ন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিক মানসে যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তার সুদূরপ্রসারী ফল আজও ঢাকার নাগরিক সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। এইরূপ ফলাফল ঔপনিবেশিক শাসনে অবশ্যম্ভাবী হলেও নগর ও অঞ্চলভেদে ছিল ভিন্ন। তাই আলোচ্য সময়ে ভারতের অন্যান্য শহরের ন্যায় ঢাকার আধুনিকায়ন হলেও এর প্রভাব ঢাকার জনজীবনকে ভিন্নমাত্রায় প্রভাবিত করেছে।

## তথ্যনির্দেশ

১ https://www.worldhistory.org/urbanization, Visited on August 10, 2023

২ V Gordon Childe, “The Urban Revolution” *The Town Planning Review,* Apr. 1950, vol. 21, No.1, Liverpool University Press, p. 4 (Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40102108).

৩ https://www.britannica.com/topic/urban-revolution

৪ প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমানা ছিল উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি, পূর্বে গারো ও লুসাই পর্বত, পশ্চিমে রাজমহল পর্বতমালা ও তৎসংলগ্ন অনুচ্চ মালভূমি ছিল প্রাচীন বাংলার সীমানা। (নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস”* শান্তিনিকেতন, ১৩৬০, পৃ. ৪; উৎস-মোঃ গোলাম মরতুজা “প্রাচীন বাংলার নগর সভ্যতার বিকাশ ও রূপরেখা”, আব্দুল মুমিন চৌধুরী ও ফখরুল আলম (সম্পাদিত) *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর”* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৬), পৃ. ১-২।

৫ শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৩০২ (বাংলা সন)।

৬ গোলাম মরতুজা, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১।

৭ গোলাম মরতুজা, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪।

৮ Kenneth L. Gillion, *Ahmedabad A Study in Indian Urban History,* (University of California Press, 1968), p.1.

৯ অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর* (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ. ১২।

১০ শেখর ভৌমিক, অরিন্দম চক্রবর্তী সম্পাদিত *বাংলার শহর উপনিবেশিক পর্ব ১* (কলকাতা: আকাশদীপ, ২০১৫), পৃ. ৩২।

১১ বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৫ ৬ষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ৬৫৬।

১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭২।

১৩ করুনানন্দ ভিক্ষু, *পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৯।

১৪ আব্দুল মুমিন চৌধুরী ও ফখরুল আলম (সম্পাদিত) *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৬), পৃ. ১।

১৫ সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়, "নগরায়ণ প্রক্রিয়ার উপাদান ও পরিমাপ-সূচক একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ" শেখর ভৌমিক, অরিন্দম চক্রবর্তী (সম্পাদিত) *বাংলার শহর* (কলকাতা, ২০১৫), পৃ. ৩২।

১৬ Report on the administration of Bengal, Year 1875.

১৭ গোলাম রব্বানী, 'Parks and Open Spaces in British Times', in *ENVIRONMENT OF CAPITAL DHAKA Plants Wildlife Gardens Parks Open Spaces Air Water Earthquake,* the Celebration of 400 Years of Capital Dhaka Project, Asiatic Society of Bangladesh (Book Chapter), Dhaka, May 2010.

১৮ ফকরুল চৌধুরী (সম্পাদিত) *উপনিবেশবাদ ও উত্তর -ঔপনিবেশিক পাঠ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১১ ২য় সংস্করণ), পৃ. ১২।

১৯ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ হলো "[...] state policy, practice, or advocacy of extending power and dominion, especially by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control of other areas". https://www.britannica.com/topic/imperialism.

২০ বিভিন্ন ঐতিহাসিক civilizing mission- এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। হেরাল্ড ফিচার টাইন ও মিশেল ম্যান সম্পাদিত (Harald Fischer- Tine and Michel Mann (eds.) *Colonialism as Civilizing Mission: Cultural Ideology in British India* (London & New York: Anthem Press, 2004, p.1-26) গ্রন্থে মিশেল ম্যান এর "Torchbearers Upon the Path of Progress": Britain's Ideology of "Moral and Meterial Progress" in India" শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে Civilizing Mission এর সংজ্ঞাটি প্রনিধানযোগ্য। তার সংজ্ঞা ও আলোচনা অনুযায়ী, "At its core, the civilizing mission was about morally and materially 'uplifting', 'improving' and later 'developing' the supposedly 'backward' or 'rude' people of India to make them more civilized and the British (and Europeans generally) at the top."Carey A. Watt and Mishel Mann (eds.), *Civilizing Missions in Colonial and* Postcolonial *South Asia: From Improvement to Development,*London-New York- Delhi: Anthem Press, 2011, p.1.

২১ Watt, *Civilizing Missions*, p.1.

২২ "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. Soorce: English Education Act 1835 (2023, January 18), https://en.wikipedia.org/wiki/English_Education_Act_183

২৩ Fran Tonkiss, *Space, the City and Social Theory: Social Relations and Urban forms,* (Cambridge : Polity Press, 2005), p. 114.

২৪ Bipin Chandra Pal, *The Calcutta Municipal Gazette*, ed. by Arun Kumar Roy, Kolkata, Information and Public Relation Department Kolkata municipal Corporation,, 2010, p. 18.

২৫ Homi k. Bhaba *The Location of Culture*, (London and New York, Routledge, 1994), p.2.

২৬ Cited by Tonkiss, *Space, the City and Social Theory* p. 120.

২৭ গ্রামবাংলা প্রবেশিকা, ৭/১৫, ডিসেম্বর ১৮৬৯.

২৮ ঢাকা প্রকাশ, ৪ জুন ১৮৬৩।

২৯ ঢাকা প্রকাশ, ৪ জুন ১৮৮২।

৩০ Ipsita Chanda, Jayeeta Bagchi (ed.)*Shaping the Discourse: Women's Writings in Bengali Periodicals, 1865-1947*, School of Women's Studies, Jadavpur University, 2014, p. 32

জমা প্রদানের তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ১৮.১১.২০২৩